“অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম। স্কুল ছিল বাড়ি থেকে অনেক দূরে। হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতাম। পড়তে হত কেরোসিন তেলের আলোয়। কিন্তু আজ আমি যা তা হতে পেরেছি যথাযথ শিক্ষা পেয়েছি বলেই। আমিও চাই ভারতের প্রতিটি শিশু, ছেলে-মেয়ে সকলে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হোক। চাই, ওরা বড় বড় স্বপ্ন দেখুক, সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং ওদের সেসব স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক।”

- ১লা এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের অংশবিশেষ।

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৯

জানুয়ারী-এপ্রিল ২০১০

সমস্থ

যুগ্ম সংকলন

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

ধনগর্বী মার্কিনমুলুকেও দেখা মেলে শিশুশ্রমিকের !

পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হল দেশজুড়ে

সংবাদ সংকলন : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। দেশজুড়ে অবশেষে চালু হল ‘শিক্ষার অধিকার আইন’। এই আইন অনুসারে ৬-১৪ বছর বয়সি সব শিশুকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক হল। এটি এখন শিশুদের মৌলিক তথা আইনি অধিকার, অর্থাৎ এই অধিকার থেকে কোন শিশু বঞ্চিত হলে সে বা তার অভিভাবকরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে।

শিক্ষার অধিকার আইন সংবিধানের ২১ ক ধারায় অন্তর্ভুক্ত হবে এই শিক্ষার অধিকার। এই আইনটি চালু হওয়া উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ১ এপ্রিল জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে বলেন, দেশের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, এই আইন কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, প্রতিশ্রুতি পালনে অর্থ যাতে প্রধান প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায় সে দিকেও সরকার লক্ষ্য রাখবে। (প্রধানমন্ত্রী একথা বললেও পশ্চিমবঙ্গবাসীর অবশ্য ভরসা নেই, কারণ রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে ‘রাজ্য বাজেটের সব টাকা দিয়েও শিক্ষার অধিকার রূপায়ণ অসম্ভব’)। গোপালকৃষ্ণ গোখলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘শতবর্ষ আগে বৃটিশ সংসদের কাছে ভারতবাসীর শিক্ষার অধিকারের *শেষাংশ ৫ পাতায়*

‘সবার জন্য শিক্ষার অধিকার’ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

- ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা
- ভর্তি হতে আসা কোন শিশুকেই ফিরিয়ে দেওয়া যাবেনা, বহিষ্কার করা যাবেনা ও বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত কোন বোর্ড পরীক্ষার প্রয়োজন নেই
- বয়সের প্রমানপত্র নেই, এই কারণে ভর্তি রদ করা যাবেনা
- সরকারি বিদ্যালয়ে বই-খাতা-কলম-পোশাক বিনামূল্যে বিতরণ
- বেসরকারি বিদ্যালয়ে দুঃস্থ শিশুদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ
- বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা, খেলার মাঠ ও পরিকাঠামো নিশ্চিত করা
- সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রতিটি শিশু যাতে বিদ্যালয়ে যায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করতে হবে
- প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে হবে লোকবসতি থেকে ১ কিলোমিটারের মধ্যে
- খরচের দায় বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে

ফিরে দেখা

সবার জন্য শিক্ষার অধিকার

রবি রায় : ১৮৫৬ সাল। গোটা ভারতবর্ষ তখন বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন। এই সময়ে একটি নিম্নবর্গের ছেলে ধাড়ওয়ারে (বর্তমানে কোন রাজ্যে জানা যায় নি) একটি সরকারি স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করে। কর্তৃপক্ষের যুক্তি ছিল তাকে যদি ভর্তি নেওয়া হয় তাহলে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রেরা সবাই স্কুল ছেড়ে দেবে, ফলে স্কুলটাই উঠে যাবে। ছেলেটিকে ভর্তি না নেওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষের যুক্তি তৎকালীন গভরনর জেনারেল ও কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্ দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয় এবং একটি স্পষ্ট নীতি নির্ধাতির হয় যে অস্পৃশ্যতার কারণে কাউকে স্কুলে ভর্তিতে বাধা দেওয়া যাবে না, এমনকী তাতে স্কুলটি যদি বন্ধ হয়েও যায় *শেষাংশ ৬ পাতায়*

ওরা কাজ করে, কেউ নিযুক্ত শ্রমে, কেউ ভিক্ষাবৃত্তিতে আর কেউবা দেহব্যবসায়। আছে পথবাসী শিশুও। এরা সবাই শিক্ষার অধিকার পাবে তো ?

দেশের একজন শিশুও যেন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়

সম্পাদকীয়

‘শিক্ষার অধিকার আইন’ এত দেরীতে কেন ?

অনেক দেরীতে হলেও সবার জন্য শিক্ষার অধিকার অবশেষে আইনি রূপ পেল, যদিও খন্ডিতাকারে। এ বছরের ১লা এপ্রিল থেকে এই আইন লাগু হল দেশজুড়ে। এই আইনে একদিকে যেমন বেশকিছু ইতিবাচক দিক আছে, তেমনি আছে একাধিক নেতিবাচক দিকও। এ ব্যাপারে আগেই আমরা আলোকপাত করেছি। বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভারতে (অবিভক্ত) আজ থেকে একশ পছর আগে ভারতবাসীর হয়ে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বৃটিশ সংসদে সব ভারতবাসী যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য দাবি করেছিলেন। তাঁর সে দাবি অবশ্য মানা হয়নি। ভারতবাসীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার দায় বিদেশী শাসকরা নেবে এমনটা আশা করাও সমীচিন নয়। এদেশে তাদের লুন্ঠন অব্যাহত রাখতে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল একদল বশংবদ কেরাণীর। এই কেরাণীকুল তৈরির জন্য যতটুকু প্রয়োজন, শিক্ষাকে তারা সেই সীমার মধ্যেই আটকে রেখেছিল, যদিও দলিল-দস্তাবেজে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর নবরচিত সংবিধানে দশ বছর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়সীমার মধ্যে শিক্ষার আইনি অধিকার যে বাস্তবায়িত হয়নি তা তো আজ সকলেরই জানা। যা পঞ্চাশ বছর আগেই হবার কথা ছিল, তা হল অবশেষে পঞ্চাশ বছর পরে। কিন্তু কেন এত দেরী হল, কোটি কোটি ভারতবাসীকে ন্যায্য অধিকার ভোগ করা থেকে কেন বঞ্চিত হতে হল, তার কোনো স্পষ্ট জবাব কোনো সরকারের পক্ষ থেকেই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যে দেশ অনেক আগেই পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছে, সেই দেশ আর যাই হোক অর্থাভাবের কথা বলতে পারেনা, আর বললেও তা যুক্তিগ্রাহ্য হবেনা। তাহলে আর কি বাধা থাকতে পারে ? রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ? অনেকেই এমন অভিযোগ করছেন। হতেও পারে। সংসদের উভয় কক্ষে শিক্ষা অধিকার বিল অনুমোদনের পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়ে যাবার পরেও তাকে কার্যকর করতে রাষ্ট্রের অনেক মাথাকে যেভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করতে দেখা যাচ্ছে তাতে এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন মনে হয়না। এই আইনের নেতিবাচক দিকগুলিকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করাই হবে সমাজ সচেতন মানুষের কাজ। আমরা জোটবদ্ধভাবে এই কাজে আছি এবং থাকবও।

শিক্ষার অধিকার আইন চালু হবার পর নানাজন বিভিন্ন দিক থেকে এর ব্যাখ্যা করছেন ও মতামত দিচ্ছেন। সমপথের পাঠক-পাঠিকাদের এ সম্পর্কে অবহিত করতে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এমন দু’টি নিবন্ধ এবং একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ বর্তমান সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হল। আগামী সংকলনগুলিতে এমন কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হবে। উপরন্তু এবারের সংকলনে সাক্ষরতা বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যও প্রকাশিত হল। শিক্ষার অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের কথা মাথায় রেখেই এবারের সংকলনটিকে সাজানো হয়েছে। অগামী সংকলনের প্রস্তুতি চলছে। মতামতের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

- সম্পাদক

শিক্ষার অধিকার আইনের সুফল

সংবাদ সংকলন : শিক্ষার অধিকার আইন বলবৎ হওয়ার পরপরই হাতেনাতে সুবিচার মিলল। দিল্লির বাসিন্দা নরেশ ভাটির মেয়ে সুমন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অনুত্তীর্ণ হয়। এর আগে সে চতুর্থ শ্রেণিতেও একবার অনুত্তীর্ণ হয়েছিল। ফলে স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী তাকে বহিষ্কার করা হয়। নরেশ দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন। শিক্ষার অধিকার আইনের উল্লেখ করে মেয়েটি যাতে ফের এই স্কুলে পড়াশোনা চালাতে পারে, তার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। - ১৮.০৪.১০

উত্তরাখণ্ডে স্কুলে পড়ুয়া ১০০ শতাংশই

সংবাদ সংকলন : স্কুলছুটের সংখ্যা প্রায় শূন্য ছুঁয়ে ফেলেছে উত্তরাখণ্ডে। আর স্কুলে ভর্তির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১০০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। এই পরিসংখ্যান চলতি বছরের। উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফে এই পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে, ২০০০-০১ সালে এ রাজ্যে স্কুলছুটের হার ছিল ১৫ শতাংশ। আর এ বছর সেটা কমে হয়েছে ০.৩১ শতাংশ। ‘‘সর্বশিক্ষা অভিযান’’-এর আওতায় গত তিন বছরে এ রাজ্যে নতুন স্কুল তৈরি হয়েছে ৬১৩টি। - ০৪.০৪.১০

পুস্তক পর্যালোচনা

তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ ও পরামর্শ (রাজ্যের পৌর প্রতিষ্ঠান ও পঞ্চায়েতগুলির জন্য অর্থবরাদ্দ সহ)
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯
ভাষান্তর ও প্রকাশনা : অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্, ৫/১/২ জি, কর্নফিল্ড রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০১৯
বিনিময় - পনেরো টাকা

সমাজকর্মীদের জন্য একটি প্রায়োজনীয় বই

আজকের দিনে সমাজ উন্নয়নে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে সহজ করতে গেলে পরস্পরকে জানা-বোঝার প্রয়োজন, প্রয়োজন স্বচ্ছতার। প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় ‘এখন পঞ্চায়েতের হাতে অনেক টাকা,তাই পঞ্চায়েত দখলের জন্য এত লড়াই’। কিন্তু টাকার পরিমাণ সঠিক কত সে তথ্য বেশিরভাগ মানুষেরই জানা নেই। বিষয়ভিত্তিক বরাদ্দের কথা জানাতো অনেক দূরের কথা। অনেক টাকা এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই - এই উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে দুর্নীতির বাস্তবতাকেই নির্দেশ করা হয়। অথচ অধিকাংশ মানুষ সচেতনভাবে প্রশাসনিক কাজের ওপর নজরদারি রাখলে তা অনেকটাই দূর করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তথ্য জানার অধিকার আইন প্রয়োগ করে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সুফল পাওয়াও গেছে। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী আইন অনুযায়ী রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ৫ শতাংশ অর্থ (বর্তমানে যার আর্থিক পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা) ‘নিঃশর্ত’ তহবিল হিসেবে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্টন করা হবে। যে তহবিল স্থানীয় মানুষের আলোচনার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা যেতে পারে। এই অর্থ কেবলমাত্র পাড়াস্তর থেকে বাজেট ও অন্যান্য পরিকল্পনা শুরু করে এবং গ্রামীণ এলাকায় গ্রামসংসদে গৃহীত পরিকল্পনা ও বাজেটের ভিত্তিতেই খরচ করা যাবে। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে / পঞ্চায়েত সমিতিতে / পৌরসভায় / জেলা পরিষদে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য সহজেই মিলবে ‘অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্’ প্রকাশিত ‘তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ ও পরামর্শ (রাজ্যের পৌর প্রতিষ্ঠান ও পঞ্চায়েতগুলির জন্য অর্থবরাদ্দ সহ)’ বইটি থেকে। একই সাথে মিলবে সুপারিশ ও সিদ্ধান্তগুলি। গ্রামসংসদে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এখনও সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তাঁদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ঘটানোর দায়িত্ব সমাজকর্মীদের। মানুষকে সচেতন করার এই দায়িত্ব পালন করার জন্য সমাজকর্মীদের হাতে থাকা চাই সঠিক তথ্য। রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ ও পরামর্শ অনুবাদ ও প্রকাশনা করে সেই প্রয়োজনীয় তথ্য সমাজকর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে এক গুরুদায়িত্ব পালন করেছে ‘অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্’। এজন্য তাঁদের অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য।

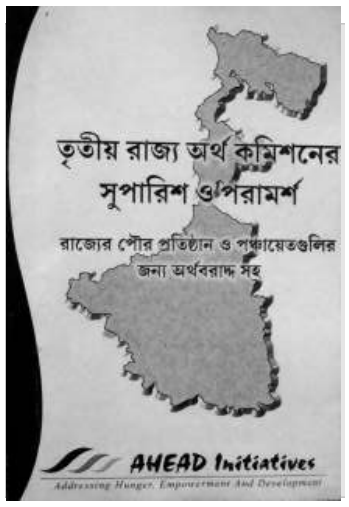

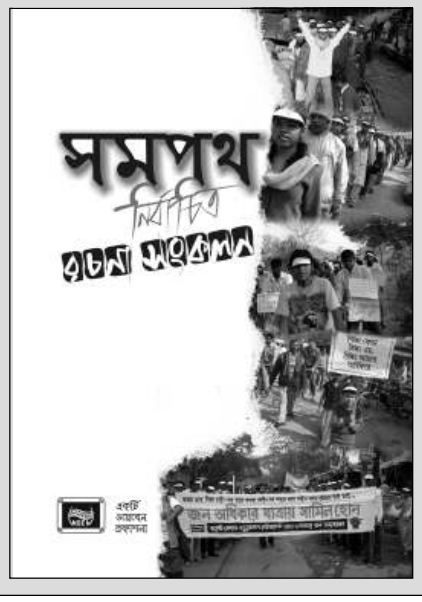

সমপথ
নির্বাচিত রচনা সংকলন

প্রকাশক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক (ওয়েবেন)
বিনিময় - পনেরো টাকা

★

প্রাপ্তিস্থান :
ওয়েবেন কার্যালয়
৬০এ/২ ব্যানার্জীপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া
কলকাতা - ৭০০ ০৩১
দূরভাষ : ০৩৩ ২৪০৫ ৫৩৩৪

৫০ শতাংশেরও বেশি শিশু স্কুলছুট

শিক্ষার অধিকার আইন কি ক্রমবর্দ্ধমান স্কুলছুট বন্ধ করতে পারবে ?

সংবাদ সংকলন : ১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার আইন দেশজুড়ে চালু হয়েছে। এই আইনে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি দেশের সকল শিশুর জন্য শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা এখন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

স্কুলে নথিভুক্তি ও স্কুলছুটের হার

বিষয়	প্রাথমিক (১ম-৫ম শ্রেণি)	উচ্চ প্রাথমিক (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি)
মোট নথিভুক্তি	১৩৪.৪ মিলিয়ন	৫৩.৪ মিলিয়ন
নথিভুক্তির অনুপাত	৯৭%	৫৪.৫%
স্কুলছুটের হার	২৯%	৫২%

Source : MHRD, JRM of SSA, 2009

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই আইন স্কুলছুট কিভাবে ঠেকাবে তার কোন দিশা এখনও পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি। এখন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে প্রায় ৫০ শতাংশ স্কুলছুট বলে জানা গেছে। দেখা গেছে ২০০৮-০৯ সালে প্রাথমিকে (১ম-৫ম) মোট নথিভুক্ত শিশুর সংখ্যা ১৩৪.৪ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ), যা ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি ফর এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (National University for Educational Planning and Administration বা NUEPA) কর্তৃক সংগৃহীত ও ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিসটেম ফর এডুকেশন (District Information System for Education বা DISE) পরিবেশিত সর্বশেষ তথ্য। এই সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণিতে, যেখানে মোট নথিভুক্ত শিশুর সংখ্যা আকস্মিকভাবে কমে দাঁড়িয়েছে ৫৩.৪ মিলিয়ন।

স্কুলছুট বলতে কি বোঝায় ?

স্কুলছুট বলতে বোঝায় স্কুলে ভর্তি হবার পর যেকোন সময়ে, শিক্ষাবর্ষের কোন সময়ে বা শিক্ষাবর্ষের শেষে নিম্ন শ্রেণি থেকে উচ্চ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার পর (বা অকৃতকার্য্য হবার পর) স্কুলের পাঠ ছেড়ে দেওয়া। সোজা কথায় মাঝপথে (এমনকী শুরুর পরেই) পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া।

স্কুলছুটের হার বলতে কি বোঝায় ?

স্কুলছুটের হার বলতে সহজ কথায় বোঝায় মাঝপথে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা ভর্তি হওয়াদের মধ্যে মত শতাংশ।

স্কুলছুটের হার নির্ণয়ের একাধিক পদ্ধতি আছে। এদের মধ্যে যে পদ্ধতিটি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সিলেক্টেড এডুকেশন স্ট্যাটিসটিক্স (Selected Educational Statistics বা SES) অনুসরণ করে থাকে সেটি নিম্নরূপ :

- মোট স্কুলছুটের হার (১ম-৫ম শ্রেণি) = {১ - (বিচার্য বর্ষের ৫ম শ্রেণিতে নাম নথিভুক্তি ÷ ৪ বছর পূর্বে ১ম শ্রেণিতে নাম নথিভুক্তি)} X ১০০
- মোট স্কুলছুটের হার (১ম-৮ম শ্রেণি)= {১ - (বিচার্য বর্ষের ৮ম শ্রেণিতে নাম নথিভুক্তি ÷ ৭ বছর পূর্বে ১ম শ্রেণিতে নাম নথিভুক্তি)} X ১০০

স্কুলছুটের কারণ কি ?

বিভিন্ন সমীক্ষায় স্কুলছুটের পিছনে যেসব কারণ দেখা গেছে মোটামুটিভাবে সেগুলি হল -

- শিশুর স্কুলে যাওয়ার অনিচ্ছা, কারণ
  ১. স্কুলে আনন্দদায়ক পরিবেশের অভাব
  ২. শিক্ষক / শিক্ষিকাদের খারাপ ব্যবহার / নির্যাতন
  ৩. বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব
- শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব
- পরিবারের কাজে ব্যস্ত থাকা
- দারিদ্রের কারণে শ্রমে নিযুক্তি
- কন্যাশিশুদের কমবয়সে বিবাহ
- কাজের খোঁজে পিতামাতার সাথে স্থানান্তরণ

স্কুলে মোট নথিভুক্তির অনুপাত (%)

Gross Enrolement Ratio # (%) from 1950-51 to 1998-99

সময়কাল	বালক		বালিকা		মোট	
	প্রাথমিক*	উচ্চ প্রাথমিক**	প্রাথমিক	উচ্চ প্রাথমিক	প্রাথমিক	উচ্চ প্রাথমিক
১৯৫০-৫১	৬০.৬	২০.৬	২৪.৮	৪.৬	৪২.৬	১২.৭
১৯৬০-৬১	৮২.৬	৩৩.২	৪১.৪	১১.৩	৬২.৪	২২.৫
১৯৭০-৭১	৯২.৬	৪৬.৫	৫৯.১	২০.৮	৭৬.০	৩৪.২
১৯৮০-৮১	৯৫.৮	৫৪.৩	৬৪.১	২৮.৬	৮০.৫	৪১.৯
১৯৯০-৯১	১১৫.৩	৭৩.৪	৮৬.০	৪৬.১	১০১.০	৬০.১
১৯৯৮-৯৯	১০০.৯	৬৫.৩	৮২.৯	৪৯.১	৯২.১	৫৭.৬

* প্রাথমিক (১ম-৫ম) বয়স ৬-১১ বছর

** উচ্চ প্রাথমিক (৬ষ্ট-৮ম) বয়স ১১-১৪ বছর

Gross Enrolment Ratio (GER) is defined as the percentage of the enrolment in classes I-V and VI-VIII and/or I-VIII to the estimated child population in the age groups 6-11 years and 11-14 and/or 6-14 years respectively. Enrolment in these stages includes under-age and over-age children. Hence the total percentage may be more than 100% in some cases.

স্কুলছটের হার (%)

সময়কাল	১ম-৫ম			১ম-৮ম		
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
১৯৬০-৬১	৬১.৭	৭০.৯	৬৪.৯	৭৫.০	৮৫.০	৭৮.৩
১৯৭০-৭১	৬৪.৫	৭০.৯	৬৭.০	৭৪.৬	৮৩.৪	৭৭.৯
১৯৮০-৮১	৫৬.২	৬২.৫	৫৮.৭	৬৮.০	৭৯.৪	৭২.৭
১৯৯০-৯১	৪০.১	৪৬.০	৪২.৬	৫৯.১	৬৫.১	৬০.৯
১৯৯২-৯৩	৪৩.৮৩	৪৬.৬৭	৪৫.০১	৫৮.২৩	৬৫.২১	৬১.১০
১৯৯৭-৯৮	৩৮.২৩	৪১.৩৪	৩৯.৫৮	৫০.৭২	৫৮.৬১	৫৪.১৪

Source: Statistics was prepared by Ministry of Human Resource Development culled out from the annual statements regularly sent by the State Governments

পাড়ার বেসরকারি স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের আসন সংরক্ষণ থাকবে

সংবাদ সংকলন: পাড়া বা বাড়ির কাছাকাছি বেসরকারি স্কুলে এবার প্রতিবন্ধী শিশুরা ভরতির সুযোগ পেতে চলেছে। এজন্য কিছু আসন সংরক্ষণ করা হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এরকমই একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। যে কোনও ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুই এই সুযোগ পাবে। এজন্য শিশুদের জন্য শিক্ষার অধিকার আইনটি (২০০৯) সংশোধন করে মন্ত্রীসভা সংসদে একটি বিল আনার অনুমোদন দিয়েছে। নতুন সংশোধনে প্রতিবন্ধী শিশুরাও 'অনগ্রসর শ্রেণি' হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়া সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই আইনের আওতায় নির্বাচিত স্কুল পরিচালন কমিটি তৈরি করা এবং সেগুলি যাতে শুধুমাত্র পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে, তা নিশ্চিত করাও এই সংশোধনীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইতিপূর্বে ২০০৬-০৭ সালের শ্রেণিগতভাবে সংগৃহীত তথ্যে দেখা গিয়েছিল প্রত্যেক শ্রেণির পরবর্তী ধাপে বিপুল সংখ্যক শিশু স্কুলছুট হয়েছে। ৫ম শ্রেণিতে এসে দেখা গেছে প্রত্যেক তৃতীয় শিশুটি স্কুলছুট এবং ৮ম শ্রেণিতে দেখা গেছে প্রত্যেক দ্বিতীয় শিশুটি আর স্কুলে আসছে না।

আইনে শিক্ষার অধিকার পেয়েছে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুরা এবং স্কুলে এই শ্রেণিগুলিই এই আইনের আওতায় পড়ে। সুতরাং, শিক্ষার অধিকার আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্কুলছুটের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু সরকারের কাছে স্কুলছুটের পরিপূর্ণ তথ্য নেই।

সরকারি হিসাবমত স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা ২.৮ মিলিয়ন। গত বছর 'সর্ব শিক্ষা অভিযান'-এর জয়েন্ট রিভিউ মিশন (Joint Review Mission বা JRM) তার রিপোর্টে স্কুলের বাইরে থাকা এই সরকারি হিসাবের সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ওড়িশা ও বারানসীতে একই পরিবারগুলিতে করা ছোট সমীক্ষায় দেখা গেছে স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা সরকারি হিসাবের চাইতে ৬ থেকে ৮ গুণ বেশি।

স্কুলের বাইরে থাকা শিশু বলতে উভয়কেই বোঝায় - স্কুলছুট ও যারা কোনদিনই স্কুলের অঙ্গনে প্রবেশ করেনি। জে-আর-এম (JRM) রিপোর্ট অনুসারে, প্রায় ২.৭ মিলিয়ন শিশু প্রতি বছর স্কুলছুট হয়। ফলে স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি হবে যা শিক্ষার অধিকার আইন লঙ্ঘনের সামিল। জে-আর-এম রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণিতে মোট নথিভুক্তির অনুপাত ৫৪ শতাংশ, অর্থাৎ দেশের ১১-১৪ বছর বয়সি সব শিশুর মধ্যে ৫৪ শতাংশের নাম স্কুলে নথিভুক্ত হয়েছে। এর অর্থ ঐ বয়সি প্রায় ৪৪ মিলিয়ন শিশু স্কুলে যায় না। ১ম-৫ম শ্রেণিতে মোট নথিভুক্তির অনুপাত ৯৭ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৪ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দূরে থেকে যায়।

স্কুলছুটের কারণ বুঝতে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (National Sample Survey Organisation বা NSSO) অথ্য দেখে নেওয়া যেতে পারে। ছাত্র ও ছাত্রীদের কাছে প্রশ্ন করেই এন-এস-এস-ও (NSSO) এই তথ্য সংগ্রহ করে। প্রায় ৪২ শতাংশ ছাত্রী জানায়, তাদের পিতা-মাতা তাদের ঘরের কাজ সামলাতে বলেছে আর ১৪ শতাংশ বলেছে, তাদের বেশি পড়াশোনার প্রয়োজন নেই বলে তাদের বড়রা বলেছে। ছাত্রদের ক্ষেত্রে মাত্র ১১ শতাংশ এই দু'টি কারণের কথা জানিয়েছে। স্কুলছুটের আসল কারণ হিসাবে ৬৮ শতাংশ ছাত্র জানিয়েছে পরিবারের রোজগারের ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করতে হয়।

শিক্ষার মৌলিক অধিকার আইনটি বেশ ত্রুটিপূর্ণ

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

গত পয়লা এপ্রিল থেকে হল শিক্ষার মৌলিক অধিকার আইন। নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি একটি ঐতিহাসিক দিন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৩ সালে শিক্ষাকে ভারতীয় শিশুদের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে। দীর্ঘ টালবাহানার পরে গত বছর ২০ জুলাই রাজ্যসভায় ভারতের সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনী গৃহীত হয়। তার এক মাস পরে ৫ আগস্ট লোকসভায় গৃহীত হয় 'দ্য রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন বিল ২০০৯'। ভারতের রাষ্ট্রপতি বিলটি অনুমোদন করায় বিলটি এখন আইনে পরিণত। ইদানীং আইনটির নোটিফিকেশন হয়েছে এবং গত পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হওয়ার কথা।

ফলে বোঝাই যায় এতাবদকাল শিক্ষাকে সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে বলেছেন, 'শিশুর শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি ভারতে অজানা কোনও প্রসঙ্গ নয়...।' তাঁর মতে শিক্ষা সমধিক গুরুত্ব পায়নি কারণ, কোনও অবস্থাতেই শিক্ষার জাতীয়করণের প্রশ্ন বিবেচিত হয়নি। রাজ্যস্তরে বিহারে বিদ্যালয় শিক্ষার রাষ্ট্রীয়করণ হলেও পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে শিক্ষার 'সমাধিকরণ'। বিদ্যালয় শিক্ষা স্থানীয় সমাজের আওতায় থাকছে আর সরকার বিদ্যালয় শিক্ষার শিক্ষকের মাইনের দায়ভার পুরো বহন করছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জাতীয়করণের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার তিনটি ধারা সমান্তরালভাবে চলছে। যেমন (ক) রাষ্ট্রীয় ধারা। (খ) রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত ধারা। (গ) বেসরকারি ধারা।

বেসরকারি ধারাকে আবার স্পষ্ট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - (১) সমাজকল্যাণমূলক ধারা। (২) ধর্মীয় গোষ্ঠী পরিচালিত ধারা। (৩) মুনাফাকামী পুঁজি নিযুক্ত ধারা।

শিক্ষার বেসরকারীকরণ নিয়ে এ রাজ্যে সরকারি কার্যক্রম দেখা যায় না, যদিও বিরোধী উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গে কার্যত শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ বেড়েই চলেছে এবং সেই অনুসারে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈন্যদশা বাড়ছেই।

অভিভাবকদের বক্তব্য শিক্ষার মান বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নততর, সেই তুলনায় সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষার মানে রয়েছে ঘাটতি। রাজ্য সরকারের চোখের সামনেই এভাবেই শিক্ষার বেসরকারীকরণ হয়ে চলেছে অথচ সরকারের কর্তাব্যক্তিদের মুখে বেসরকারীকরণ বিরোধী বুলি। যারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ছে তারা জানে যে সরকারের বুলি কথার কথা মাত্র।

আসলে সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে ঢালাও অনুমোদন দিয়ে চলেছে। নতুন শিক্ষা আইনেও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে জোরালো কোনও বক্তব্য অনুপস্থিত। শিক্ষার মৌলিক অধিকার দানের প্রক্রিয়াটিকে সরকার, মনে হয় বেসরকারি পুঁজির সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। কিন্তু গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা করে যেখানে টাকা কামানো যাবে না সেখানে ব্যবসায়ীরা কি পুঁজি খাটাতে এগিয়ে আসবে? সমস্যাটা সেইখানে। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিয়েই তো সমস্যা! গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা - অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। অন্য কোনও পথ নেই।

আরও অনেক সমস্যা নতুন শিক্ষা আইনে আছে। এ আইনের অসম্পূর্ণতা আছে। অসম্পূর্ণতা 'শিশু' শব্দের ব্যাখ্যায়। আইনের ২ (c) ধারায় বলা হয়েছে, 'Child means a male or female child of the age of 6 to 14 years.' এ তো 'শিশু'র খণ্ডিত অংশমাত্র। রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে 'শিশু'র সংজ্ঞা ভারতের লোকসভা আইন করে মেনে নিয়েছে তা হল ০-১৮ বছর বয়স। শিশুর মৌলিক অধিকারের কথা বলা হলে ০-১৮ বছর বয়স্ক শিশুদের কথাই আইনসিদ্ধ। অথচ শিক্ষা মৌলিক অধিকার আইনে (নং ৩৫ অফ ২০০৯) বাদ গেছে দুইটি বয়স্ক-স্তরের শিশুরা - (i) ০-৫ বছর বয়সী ও (ii)১৫-১৮ বয়সী শিশু।

সুতরাং গৃহীত 'দ্য রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট ২০০৯' আইনটি অসম্পূর্ণ। এই আইনটি সম্পূর্ণ করার জন্য পুনরায় ভারতের সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে ০-৫ বছরের শিশুদের সুস্বাস্থ্য এবং সুশিক্ষা নিশ্চিত করা না গেলে ৬-১৪ বছর বয়সের শিশু শিক্ষা উন্নতমান হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে Protection of Child Right Act 2005 অর্থহীন হয়ে পড়বে।

সুতরাং গৃহীত 'দ্য রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট ২০০৯' আইনটি সম্পূর্ণ করার জন্য পুনরায় ভারতের সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে ০-৫ বছরের শিশুদের সুস্বাস্থ্য এবং সুশিক্ষা নিশ্চিত করা না গেলে ৬-১৪ বছর বয়সের শিশু শিক্ষা উন্নতমান হতে পারে না।

শিক্ষা আইনের বিভিন্ন বিধান নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় সারা ভারতে যেখানে Common School System নিয়ে আলোড়ন চলছে সেখানে Art ২(l) ধারায় বিদ্যালয়ের 'স্পেসিফায়েড ক্যাটেগরি'র কথা বলা হয়েছে। আবার Art ৮ (b) ধারায় 'নেবারহুড স্কুল'-এর কথা আছে কিন্তু বিশদ কিছু বলা নেই। এসব দায়সারা গোছের কথা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে ইদানীং 'শিশুর শিক্ষার অধিকার আইন কী চায়?' শিরোনামে এক দৈনিকে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে Common School System-এর যথার্থতা নিয়ে একটি বাক্যও নেই। নেই সমগুণমানের বিদ্যালয় ব্যবস্থা নিয়ে কোনও কথা। সব স্কুলকে একই পর্যায়ে এনে একই মানের সর্বভারতীয় বিদ্যালয়-শিক্ষা চাই। আমাদের স্লোগান, 'নির্ধন হো ইয়া ধনবান/সবকো শিক্ষা এক সমান।' এটাই তো শিক্ষার অধিকার আইনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শ্রেণি বিভক্ত সমাজ আমরা চাই না, শ্রেণি বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাও আমরা চাই না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কথা উচ্চারণ করতে পারছে না কেন?

গরিব শিশুরা অনেকে স্কুলে যেতে পারে না আর্থিক অপারগতার জন্য। অথচ Art ১০-এ বলা হয়েছে শিশুকে স্কুলে পাঠানোর দায় পিতামাতার। এর অর্থ কী? সরকারকে এই দায় বহন করতে হবে এবং তবেই মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হবে, নইলে আইন করলেও কিছু হবে না। যাদের খাদ্যের সংস্থান নেই তাদের কাছে খাদ্যই ভগবান, শিক্ষা নয়। একথাকে এড়িয়ে গেলে হবে পিছনে চলা। শিক্ষা মৌলিক অধিকার আইন তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, এমন ভাবা ভুল।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিশু শিক্ষার ভিত্তি। কিন্তু সেই ভিতকে মজবুজ করার কোনও কথা Art ১১-এ নেই। এ দায় রাজ্য সরকারের কাঁধে চাপিয়ে বলা হয়েছে 'may make necessary arrangement'। অর্থাৎ রাজ্য সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেও পারে আবার তা নাও করতে পারে। এভাবে এই Act-এর আওতা থেকে ০-৫ বছর বয়সের ১৭ কোটি শিশুকে অবহেলা করা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি/বালোয়াড়ি ব্যবস্থাগুলোকে কখনওই পূর্ণাঙ্গ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলা যায় না। অন্য দিকে যে শিশু ভালো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পায়নি সেই শিশু কীভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নতমান অর্জন করবে? শিশুর বিকাশের এই নিকৃষ্ট পন্থা বর্জন করে আইনটিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপন্ন শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করা গেলে শিক্ষার মৌলিক অধিকার যে অপহৃত হয় একথা সরকারকে স্বীকার করে নিয়ে বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষার্থীরদের সাথে একসঙ্গেই করতে হবে। অর্থাৎ সাধারণ স্কুলগুলোতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের পড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এইজন্য নতুন আইন করতে হবে। শিক্ষকেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষকের ব্যবস্থা সম্বন্ধে Act-এ যে ব্যবস্থা আছে তাও ন্যূনতম। ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারণ একটি সেকেলে ব্যবস্থা। আসলে ন্যূনতম প্রয়োজন হচ্ছে ক্লাস-ইউনিট প্রতি একজন শিক্ষক নিয়োগ। ছাত্র কম আছে বলে সব শ্রেণির ছাত্রদের একসঙ্গে পড়ানো হলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সর্বনাশ। এই সর্বনাশের ব্যবস্থাপত্র রয়েছে অ্যাক্টের সিডিউলে। এই অব্যবস্থা রদ না হলে মৌলিক অধিকার অমৌলিক হয়ে যায়। Art ২৬-এ বলা হয়েছে, যে কোনও বিদ্যালয়ে কোনও সময়েই শতকরা দশ শতাংশের বেশি পদ খালি থাকতে পারবে না। ভালো কথা। কিন্তু এই ধারায় বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকপদ খালি রাখা সম্বন্ধে কোনও বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। কিন্তু কেন? নিয়ম ও ব্যবস্থা সব ধরনের স্কুলের জন্য একই হওয়া প্রয়োজন, একথা পঠনপাঠনের স্বার্থেই বলতে হয়।

একইভাবে বেসরকারি বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটিকে লাগামছাড়া নিয়মহীন করা হয়েছে। Art ২১ (২)-এ বলা হয়েছে যে বেসরকারি বিদ্যালয় ছাড়া সব বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে স্থানীয় প্রশাসন ও অভিভাবকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও নিয়মকানুন মানার দায় নেই। তাজ্জব ব্যাপার। এ তো অর্থবান শিক্ষা ব্যবসায়ীদের তোল্লাই দেওয়ার ব্যবস্থার নামান্তর। আইন এমন হয় নাকি?

শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য রয়েছে, Art ৮(i), যেখানে বলা হয়েছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আবার Art ২৩(২) ধারায় বলা হয়েছে যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নেই বা ন্যূনতম যোগ্যতা নেই তারা 'Shall acquire such minimum qualifications within a period of five years.'। এটা কী করে সম্ভব? কারণ বর্তমানে ভারতে রয়েছে প্রশিক্ষণহীন ৭.৭২ লক্ষ শিক্ষক। আইন অনুযায়ী সব শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গেলে আরও লাগবে ১২.০৬ লক্ষ শিক্ষক। ছাত-শিক্ষকের অনুপাত যদি ৩০:১ ধরা হয় তবে আরও ৫.১ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতে বিদ্যালয় সংখ্যার ৫৩.২ শতাংশ বিদ্যালয়ে অর্থাৎ ৫.২৯ লক্ষ বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত ৩০:১ এর অনেক উপরে।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়স্তরে ছাত্র-শিক্ষক সরকারি অনুপাত ৮০:১; এই অনুপাত বাস্তব ক্ষেত্রে আরও বেশি। নতুন শিক্ষা আইন চালু হলে Art ২৫(l) অনুযায়ী আগামী ছয় মাসের মধ্যে ছত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০:১-এ উন্নীত করতে হবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতকে টেনে ৩০:১-এ তোলা এক দুরূহ ব্যাপার। প্রশাসন কীভাবে সেই কাজ করবে জানি না। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থের। শিক্ষা সেসের অর্থে খুব অল্প কাজই নির্বাহ হতে পারে। বাকি অর্থ নানাভাবে সংগ্রহ করতে হবে।

লেখক জাতীয় শিক্ষক

দৈনিক স্টেটসম্যান (১৪.০৪.২০১০) থেকে পুনর্মুদ্রিত

দরিদ্রদের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছাতে হলে তাদের আয় বৃদ্ধি জরুরি

ডঃ ভরত ঝুনঝুনওয়ালা

দরিদ্রদের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার সহজ ও স্পষ্ট উপায় হল দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি করা। কিন্তু শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনে ঠিক এর উল্টোটাই করা হচ্ছে। এতে দরিদ্রদের যে একটা অভাবের দিক আছে তার প্রতি নজর দেওয়া হয়নি। তার পরিবর্তে বর্তমান ব্যবস্থার মাধ্যমে অবৈতনিক শিক্ষার নামে দরিদ্রদের ওপর আরও দারিদ্র চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত রাজ্য মিলিয়ে ২০০৭ সালে ১,৫১,০০০ কোটি টাকার বিক্রয় কর সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ৯২,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে শুধু সরকারি শিক্ষকদের বেতন দিতে। রাজ্য সরকারগুলি এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে। উন্নয়নের কাজ করার মতো কোনও অর্থই আর তাদের হাতে নেই। সরকারি স্কুল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই ছিল দরিদ্রদের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে তার উল্টোটা। উন্নয়নের কাজ থমকে দাঁড়িয়েছে, কারণ শিক্ষকদের বেতনই রাজ্যগুলির রাজস্ব গিলে ফেলছে। দরিদ্রদের আয়ও এতটা কম থাকছে যে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের আর স্কুলে পাঠাতে পারছে না।

অবৈতনিক শিক্ষা দরিদ্রদের কাছে একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে তারা দারিদ্রের জাঁতাকলে জড়িয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান এবং ভারতের উত্তর প্রদেশের শিক্ষার মান সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'বেসরকারি স্কুলগুলি হয়তো সব সময় ভাল স্কুল নয়, কিন্তু খারাপ স্কুল সর্বদাই মূলত সরকারি স্কুল। এইসব বেহাল সরকারি স্কুলের সাফল্যের মান এতটাই নীচু যে তাদের ছাত্ররা চার বছর ধরে শিক্ষালাভের পর কার্যত কোনও দক্ষতাই অর্জন করে উঠতে পারে না।' সরকারি স্কুলগুলিতে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও এই বেহাল চিত্র দেখা যাচ্ছে। সরকারি স্কুলগুলিতে যেখানে পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৪৩.৪ শতাংশ সেখানে সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন সব বেসরকারি স্কুলে তাদের সংখ্যা ২.৩ শতাংশ। অথচ এইসব বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার মান ও সাফল্যই বেশি। বেসরকারি স্কুলগুলির গুণগত উৎকর্ষের মূল কারণ হলো তাদের দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা। বস্তিতে ও গ্রামেগঞ্জে যে একঘরের স্কুল চালু রয়েছে তারা দুর্বল পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়াও উন্নতমানের শিক্ষাদান করে চলেছে। শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনে স্বল্প ব্যয়ের এসব সফল ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারি স্কুল বাদে আর সমস্ত স্কুলকে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য তিন বছরের মধ্যে নির্ধারিত বিধিনিয়ম ও মানে পৌঁছাতে হবে, অন্যথায় তাদের বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বিপরীত দিকে যুক্তি হল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি যে উন্নত মানের শিক্ষা দিতে পারছে এবং তারা যে সফল তার কারণ হল পদস্থ অফিসারদের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়ে। ফলে সেসব স্কুলের ওপর একটা চাপ থাকে। কিন্তু সাধারণ দরিদ্র মানুষের সেই চাপ সৃষ্টি করর ক্ষমতা নেই। আরেকটি যুক্তি হল উন্নত দেশগুলি আইনি গণ্ডির মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে বেধে ফেলায় তারা শিক্ষার বর্তমান উচ্চমান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটেনে সেটা ঘটেছে ১৮৭০ সালে। ভারতকেও তা অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড সেই সময় ভারত থেকে প্রচুর অর্থ পেত। ভারতের জনগণকে দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে সরকারি স্কুল ব্যবস্থার খরচ জোগানো হতো। সরকারি স্কুলগুলি তাদের উচ্চ আয়ের ফসল নয়। উচ্চ আয়ের পরিণতি হচ্ছে এসব স্কুল। আমাদের দেশে সরকারি স্কুল ব্যবস্থা যে ব্যর্থ তা আজ খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাঁর দেশবাসীকে শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা ভারতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়। এই ভারতকে তৈরী করেছে বেসরকারি স্কুলগুলি।

বলা হচ্ছে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনের লক্ষ্য সঠিক দিশায় নিবদ্ধ রয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের জাঁতাকল আরও মারাত্মক। কোনও মানুষ বেসরকারি স্কুলের ওপর ক্ষুব্ধ হলে সে প্রতিকারের জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণকর্তার দ্বারস্থ হতে পারে। কিন্তু সে সরকারি স্কুলের ওপর ক্ষুব্ধ হলে কার কাছে যাবে? তার কাছে আপীল করার মতো কোনও কোর্ট নেই, সেক্ষেত্রে সরকারি অফিসাররা একই সঙ্গে 'চোর ও বিচারক।'

শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন দরিদ্রদের শিক্ষা দাবি করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল যেখানে একজন দরিদ্রের নিজের পকেট থেকে শিক্ষার ব্যয় জোগানোরই ক্ষমতা নেই সে কী করে ওই উদ্দেশ্যে আদালতে গিয়ে মামলা করবে? এর সঠিক সমাধানসূত্র হল দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি এবং তাদের সুপ্ত চাহিদাগুলি পূরণ করা। ২০০৭ সালে রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষাখাতে ৯২,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করেছে আরও ২৩,০০০ কোটি টাকা। বছর বছর ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ২০১০-১১তে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১,৭০,০০০ কোটি টাকা। এই টাকা ২৫ কোটি স্কুল শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেত। তাহলে প্রত্যেক শিশু মাসে ৫৬০ টাকা পেত। এই পরিমাণ টাকা কোনও ছোট শহরে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের ফি জোগানোর পক্ষে যথেষ্ট। আইনে এই সুযোগ থাকা উচিত ছিল। বেসরকারি স্কুলগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ কেবল বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, হোম ওয়ার্ক, পরীক্ষার তদারকি ও খেলার সামগ্রীর ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ব্যয়বহুল অদক্ষ সরকারি স্কুলগুলিকে পুষতে গিয়ে যদি স্বল্প ব্যয়ের দক্ষ সরকারি স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তার ফল হিতে বিপরীত হবে। দরিদ্রদের নাম করে শিক্ষায় মাফিয়ারাজকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না।

দৈনিক স্টেটসম্যান (১৯.০৪.১০) পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের পূনর্মুদ্রন।

প্রসঙ্গ : বিদেশি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

যথাযোগ্য শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাদান পর্বে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো। মাতৃদুগ্ধ যেমন শারীরিক পুষ্টিতে অপরিহার্য, মাতৃভাষা তেমনই মানসিক পুষ্টির প্রধান অবলম্বন। মাতৃভাষা অনবরত এবং অনায়াস শ্রুতির ফলে সহজে, আনন্দে এবং সর্বোপরি স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে শিশুকে পাঠ্যবিষয় আত্মস্থ করতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রায় দু'শো বছরের বৃটিশ শাসন এবং তার উত্তরসাধক বর্তমান ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষায়তানের কৃপায় শিক্ষিত ভারতবাসীর অধিকাংশই মাতৃভাষাকে কৃপা করতে শিখেছেন, ভালবাসতে শেখেননি। তাঁরা ভুলে যান যে, মাতৃভাষায় বিগলিত হয়ে যে শিক্ষা শিশুমনে প্রবাহিত হয়, সেই শিক্ষারই উপলব্ধি পরতে পরতে বিস্তার সম্ভব। মাতৃভাষা ছাড়া মানুষের হৃদয়ের মৌলিকত্ব, তার প্রতিভা সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারেনা, জীবনবোধের শিক্ষা তো প্রায়শই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ফলে পরিণত, উচ্চশিক্ষিত মানুষও অনেকক্ষেত্রে সমাজ তথা দেশের উন্নতির সহায়ক হতে পারেন না। এ জন্যই প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে।

শিক্ষার গোড়াতেই বিদেশি ভাষার চাপ থাকলে মাতৃভাষার মাধুর্য অধরাই থেকে যাবে। শিক্ষার্থীর সঙ্গে জনসাধারণ, এমনকী পরিবারেরও দূরত্ব বাড়তে থাকবে। এটা কি পরিতাপের বিষয় নয়, যখন দেখা যায় কোনও মানুষ সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বিষাদের কাহিনী ব্যক্ত করার জন্যও বিদেশি ভাষার শরণ নেয়? এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য প্রবন্ধের অন্তর্গত 'বাঙলা সাহিত্যের আদর' শীর্ষক প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, উচ্চপদের উচ্চশিক্ষিত বাঙালিবাবু তাঁর স্ত্রীকে ভৎসনা করেন 'ছাইভস্ম বাঙলা' পড়ার জন্য - কারণ ওগুলো 'immoral'। স্ত্রী 'immoral' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন 'immoral'-এর অর্থ যা morality-র বিরুদ্ধে। morality-র মানে স্ত্রীর কাছে বোধগম্য নয়। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন - 'morality কি চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষ?' স্বামীর উত্তর - 'ওর আর বাঙলা কোথা পাব? এই যা moral নয় তাই আর কি।' শেষমেশ স্বামী বোঝাতে না পেরে স্ত্রীকে বলেন - 'ছি ছি। O woman! My name is stupidity.' তখনও স্ত্রীর প্রশ্ন থেকে যায় - 'কাকে বলে?'

সংবাদ প্রতিদিন-এর উত্তর সম্পাদকীয়ে গত ১৮ এপ্রিল'১০ প্রকাশিত আলপনা ধরের নিবন্ধের অংশবিশেষ।

---

১ পাতার শেষাংশ.... দাবিতে সরব হয়েছিলেন গোখলে। তাঁর সেদিনের দাবিকে মান্যতা দিতে ভারতীয় সংবিধান দেশের প্রতিটি নাগরিককে দিয়েছে শিক্ষার অধিকার যা সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম...'। গোখলে যখন এই দাবি জানান সেসময় অবিভক্ত ভারতে শিক্ষার হার ছিল ৬ শতাংশ। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের কথা উল্লেখ করলেও একথা জানান নি সংবিধান প্রদত্ত অধিকার বাস্তবায়নে এত দেরি হল কেন। 'শিক্ষার অধিকার আইন'টি রূপায়ণে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা চেয়েছেন। তাঁর মতে আদর্শ শিক্ষক ছাড়া জ্ঞানের আলো সব ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা দেখা এবং তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়াটা নিশ্চিত করাটা যেমন স্থানীয় প্রশাসনের কর্তব্য, এক্ষেত্রে তাদের মা-বাবাকেও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী, আগামী ৫ বছরে এই আইন কার্যকর করতে সরকারের মোট খরচ হবে ১.৭১ লাখ কোটি টাকা। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলিকে ২৫ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের হিসাব থেকে জানা যায়, এই আইনটি রূপায়িত হলে দেশের ২২ কোটি ছেলেমেয়ে সরাসরি উপকৃত হবে, যাদের মধ্যে প্রায় ৯২ লক্ষ ছেলেমেয়ে চরম গরিবির শিকার হয়ে এখনও স্কুলের গণ্ডির বাইরে রয়েছে। আইন অনুসারে প্রতিটি বেসরকারি স্কুলকে ভরতির ক্ষেত্রে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে সমাজের পিছিয়ে পড়া গরিব অংশের শিশুদের জন্য। এই আসনগুলিতে সমাজের অন্যান্য অংশের ছেলেমেয়েদের তারা ভরতি করতে পারবে না।

শিক্ষার অধিকার আইন

অর্থবরাদ্দ নিয়ে জলঘোলা চলছেই

সংবাদ সংকলন : শিক্ষার অধিকার আইনকে কার্যকর করতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাতে কেন্দ্র-রাজ্য কে কতটা দায় নেবে তার কোন স্পষ্ট ছবি এখনও চোখে পড়ছে না। কয়েকটি বড় রাজ্যের আগামী পাঁচ বছরের আনুমানিক খরচের যে হিসাব পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ:

উত্তরপ্রদেশ	৩৮,৯০৯ কোটি টাকা
পশ্চিমবঙ্গ	১৪,৩৪২ কোটি টাকা
অন্ধ্রপ্রদেশ	১০,৬২১ কোটি টাকা
মহারাষ্ট্র	৯,৮৫২ কোটি টাকা
ঝাড়খন্ড	৮,৬১৩ কোটি টাকা
মধ্যপ্রদেশ	৮,২১৩ কোটি টাকা
আসাম	৭,২৫২ কোটি টাকা
গুজরাত	৭,০৩৫ কোটি টাকা

এই খরচের ৫৫ শতাংশ বহন করবে কেন্দ্র আর বাকী ৪৫ শতাংশ খরচের দায় রাজ্যগুলির। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের এক রিপোর্টে দেখা গেছে, কেন্দ্রের সাথে রাজ্যগুলির আলোচনার সময় অর্থবরাদ্দের ব্যাপারে কেন্দ্র-রাজ্য অনৈক্য থেকেই গেছে। ছত্তিশগড় ছাড়া আর সব রাজ্যই অর্থবরাদ্দের ব্যাপারে দোলাচলের মধ্যে আছে। আলোচনার সময় উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধি জানিয়েছে, এই আইন কার্যকর করতে তাদের উপর ১৮,৫০০ কোটি টাকার বোঝা বাড়বে। বিহার সরাসরিই জানিয়েছে কেন্দ্র-রাজ্য অর্থবরাদ্দের অনুপাত হওয়া উচিত ৯০:১০। অর্থবরাদ্দের ব্যাপারে এমনকী দিল্লি সরকারও বিহারের সাথে একমত। এই আইন পশ্চিমবঙ্গে যথাযথভাবে কার্যকর করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের কাছে ৭৫ শতাংশ অর্থ দাবি করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জন্য দাবি করা হয়েছে ৯০ শতাংশ অর্থ।

কেন্দ্রকেই টাকা দিতে বিভিন্ন রাজ্যের চাপ : শিক্ষার অধিকার আইন রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রের সাহায্য বাড়াতে বিভিন্ন রাজ্য চাপ অব্যাহত রেখেছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী (যিনি সরকারি কোষ থেকেই নিজের মূর্তি বসাতে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন) আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, এই আইন রূপায়ণের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক দায়ভার তাঁর সরকার নিতে পারবে না। কেন্দ্রকেই তা নিতে হবে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের সাথেই সুর মিলিয়েছে মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কর্ণাটক ও বিহার। প্রসঙ্গত, হিসেবমত এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বছরে খরচ হবে ৪০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্র দেবে ২২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু চলতি আর্থিক বছরে সেই টাকা দেওয়ার অবস্থাতে কেন্দ্র নেই বলে জানা গেছে। এ বছর কেন্দ্রের বরাদ্দ মাত্র ১৫ হাজার কোটি টাকা।

কপিল সিব্বলের প্রতিক্রিয়া : অর্থের অভাব দেখিয়ে যেসব রাজ্য শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর করতে আপত্তি তুলেছে, তাদের সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিব্বাল। তাঁর দাবি, এইসব রাজ্যের সরকার চায় না রাজ্যবাসীর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছোক। সিব্বালের স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া, ''রাজ্য সরকারিগুলি যদি শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ করতে না চায়, তাহলে রাজ্যের মানুষের কাছে এই বার্তাই যাবে যে, রাজ্য সরকার চায়না শিক্ষার প্রসার হোক।''

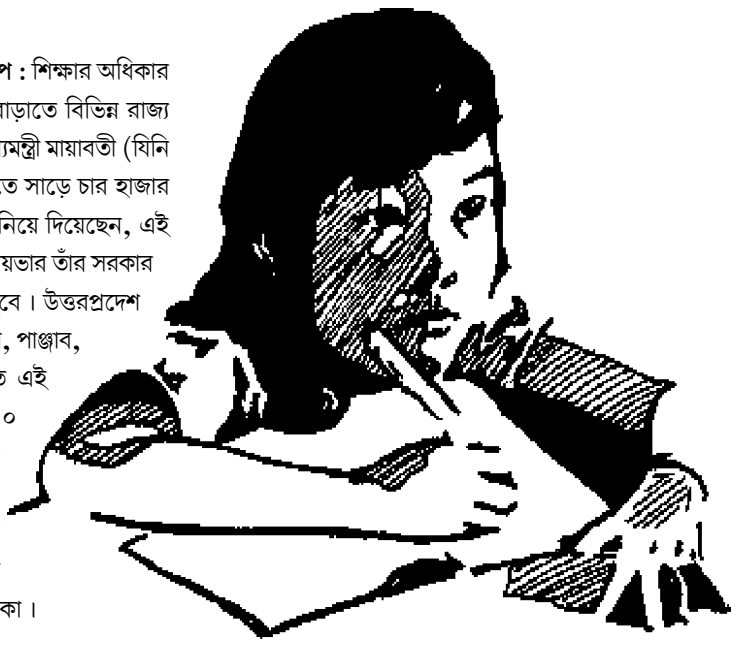

১ *পাতার শেষাংশ.....* (সূত্র : Report of the Indian Education Commission, 1882)। বৃটিশশাসিত ভারতে (সম্ভবত) এই ঘটনাটির মাধ্যমেই প্রথম শিক্ষার অধিকার বিষয়টি স্বীকৃত হয়, যদিও অর্থের অভাব কারণ হিসাবে দেখিয়ে সবার জন্য শিক্ষার দায় নিতে বৃটিশ সরকার অনাগ্রহী ছিল। প্রসঙ্গত, ১৮৭০ সালেই কিন্তু বৃটেনে সব শিশুর শিক্ষার অধিকার সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়। সেক্ষেত্রে অর্থের অভাব ঘটে নি, ভারতীয় শিশুদের বঞ্চিত করে ভারত শোষণের টাকায় এই অধিকার পায় বৃটিশ শিশুরা।

এরপর থেকে ভারতীয় জনমত অবৈতনিক ও আবিশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের দাবিতে সংগঠিত হতে থাকে। ১৮৮১ সালে ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের কাছে দাদাভাই নওরোজী ভারতীয় শিশুদের জন্য চার বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবি (যা শিশুদের মূলত সাক্ষর হতে সাহায্য করবে) উপস্থাপন করেন। এটি ছিল প্রথম উদ্যোগ। এরপর ১৯১০ সালে এ ব্যাপারে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং ১৯১২ সালেও পুনরায় একই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কোনটিই অবশ্য কোন কাজে আসেনি। গোখলের উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও ১৯১৩ সালের শিক্ষানীতিতে যা বলা হয়* তা অতিব চমকপ্রদ, পড়লে যেন মনে হয় বৃটিশ সরকার তার ভারতীয় প্রজাসকলের শিক্ষার জন্য একান্তই আন্তরিক। কিন্তু বহু পূর্বেই ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলার পিছনে বৃটিশ সরকারের আসল মতলবটা ধরা পড়ে মেকলের কথায়। ১৮৩৫ সালে বৃটিশ উপনিবেশ ভারতের শিক্ষানীতির স্থপতি টমাশ মেকলে বলেছিলেন, ''আমরা অবশ্যই একটি শ্রেণি গড়ে তুলতে যথাসাধ্য করব যারা আমাদের ও যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা শাসন করব তাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে, যারা রক্ত এবং বর্ণে ভারতীয় হবে, কিন্তু রুচী, মতামত, ভাষা ও মেধার ক্ষেত্রে ইংরেজ হবে।'' বস্তুত পরবর্তীকালে এটাই হয়েছে।

যাইহোক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি জনমনে ক্রমশই বাড়তে থাকে। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে আবশ্যিক শিক্ষার আইন দেশের বেশিরভাগ রাজ্যের নবগঠিত আইনসভায় অনুমোদন পায়, এগুলিতে ভারতীয়রাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৯৩৭ সালে গান্ধীজি তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা পেশ করেন, যাতে সব শিশুর সাত-আট বছর সময়কালের জন্য শিক্ষা এবং শিক্ষাকে সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী করে তোলার কথা বলা হল। এইসব প্রচেষ্টার ফল হিসাবে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার দায় যে রাষ্ট্রের এবং সব শিশুরই যে এ ব্যাপারে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার আছে তা জাতীয়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল।

অবশেষে ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা সারজেন্টের (Sir Jhon Sargent) পরামর্শে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এইসব মতামত গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে (১৯৪৪) ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুদের জন্য ৪০ বছরের মধ্যে (১৯৪৪-৮৪) অবৈতনিক এ আবিশ্যিক শিক্ষার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয় যা সেসময় 'সারজেন্ট পরিকল্পনা' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ভারতের জাতীয় মতামত এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার বিরুদ্ধে ছিল। বি.জি.খেরের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে আগামী ১৬ বছরের মধ্যেই (১৯৪৪-৬০) এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। পরবর্তীকালে এই প্রস্তাবই ভারতীয় সংবিধানে (Directive Principle of State Policy) অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপরের ইতিহাস সকলেরই জানা।

---

* It begins as under:

"His Most Gracious Imperial Majesty the King Emperor, in replying to the address of the Calcutta University on the 6th January 1912, said: -

"It is my wish that there may be spread over the land a network of schools and colleges from which will go forth loyal and manly and useful citizens, able to hold their own in industries and agriculture and all the vocations in life. And it is my wish too, that the homes of my Indian subjects may be brightened and their labour sweetened by the spread of knowledge with all that follows in its train, a higher level of thought, comfort and of health. It is through education that my wish will be fulfilled, and the cause of education in India will ever be very close to my heart."

The Government of India, have decided, with the approval of the Secretary of State, to assist Local Governments, by means of large grants from imperial revenues as funds become available', to extend comprehensive systems of education in the several provinces. Each province has its own educational system, which has grown up under local conditions and become familiar to the people as a part of their general well being. In view of the diverse social conditions in India there cannot in practice be one set of regulations and one rate of progress for the whole of India. Even within provinces there is scope for greater variety in types if institutions that exists today. The Government of India has no desire to deprive Local Governments of interest and initiative in education. But it is important at intervals to review educational policy in India as a whole. Principles, bearing on education in its wider aspects and under modern conditions and conceptions, on oriental and on the special needs of the domiciled community, were discussed at three important conferences of experts and representative non-officials held within the last two years. These principles are the basis of accepted policy. How far they can at any time find local application must be determined with reference to local conditions.

On the question of compulsory and free elementary education, the Policy stated: " The propositions that illiteracy must be broken down and that primary education has, in the present circumstances of India, a predominant claim upon the public funds, represent accepted policy no longer open to discussion. For financial and administrative reasons of decisive weight, the Government of India have refused to recognize the principle of compulsory education, but they desire the widest possible extension of primary education on a voluntary basis. As regards free elementary education, the time has not yet arrived when it is practicable to dispense wholly with fees without injustice to the many villages, which are waiting for the provision of schools. The fees derived from those pupils who can pay them are now devoted to the maintenance and expansion of primary education, and a total remission of fees would involve to a certain extent a more prolonged postponement of the provision of schools in villages without them. In some provinces, elementary education is already free and in the majority of provinces, liberal provision is already made for giving free elementary instruction to those boys whose parents cannot afford to pay fees. Local Governments have been requested to extend the application of the principle of free elementary education amongst the poorer and more backward sections of the population. Further than this it is not possible at present to go."

জনগণনা ২০০১ : ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমুহের সাক্ষরতার হার (%) অনুযায়ী বিন্যাস

ক্রম	রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	মোট	পুরুষ	নারী	সাক্ষরতার হার জনগণনা, ১৯৯১	সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন (১৯৯১-২০০১)
উচ্চ সাক্ষরতার হার (৮০ শতাংশের বেশি)						
০১	কেরালা	৯০.৯২	৯৪.২০	৮৭.৮৬	৮৯.৮১	১.১১
০২	মিজোরাম	৮৮.৪৯	৯০.৬৯	৮৬.১৩	৮২.২৭	৬.২২
০৩	লক্ষাদ্বীপ*	৮৭.৫২	৯৩.১৫	৮১.৫৬	৮১.৭৮	৫.৭৪
০৪	গোয়া	৮২.৩২	৮৮.৮৮	৭৫.৫১	৭৫.৫১	৬.৮১
০৫	দিল্লি*	৮১.৮২	৮৭.৩৭	৭৫.০০	৭৫.২৯	৬.৫৩
০৬	চন্ডিগড়*	৮১.৭৬	৮৫.৬৫	৭৬.৬৫	৭৭.৮১	৩.৯৪
০৭	পন্ডিচেরী*	৮১.৪৯	৮৮.৮৯	৭৪.১৩	৭৪.৭৪	৬.৭৪
০৮	আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ*	৮১.১৮	৮৬.০৭	৭৫.২৯	৭৩.০২	৮.১৭
০৯	দমন ও দিউ*	৮১.০৯	৮৮.৪০	৭০.৩৭	৭১.২০	৯.৮৯
সাক্ষরতার হার জাতীয় গাড়ের (৬৫.৩৮%) বেশি কিন্তু ৮০ শতাংশের কম						
০১	মহারাষ্ট্র	৭৭.২৭	৮৬.২৭	৬৭.৫১	৬৪.৮৭	১২.৩৯
০২	হিমাচল প্রদেশ	৭৭.১৩	৮৬.০২	৬৮.০৮	৬৩.৮৬	১৩.২৭
০৩	ত্রিপুরা	৭৩.৬৬	৮১.৪৭	৬৫.৪১	৬০.৪৪	১৩.২২
০৪	তামিলনাড়ু	৭৩.৪৭	৮২.৩৩	৬৪.৫৫	৬২.৬৬	১০.৮১
০৫	উত্তরাঞ্চল	৭২.২৮	৮৪.০১	৬০.২৬	৫৭.৭৫	১৪.৫৩
০৬	গুজরাট	৬৯.৯৭	৮০.৫০	৫৮.৬০	৬১.২৯	৮.৬৮
০৭	পাঞ্জাব	৬৯.৯৫	৭৫.৬৩	৬৩.৫৫	৫৮.৫১	১১.৪৫
০৮	সিকিম	৬৯.৬৮	৭৬.৭৩	৬১.৪৬	৫৬.৯৪	১২.৬১
০৯	পশ্চিমবঙ্গ	৬৯.২২	৭৭.৫৮	৬০.২২	৫৭.৭০	১১.৫২
১০	মনিপুর	৬৮.৮৭	৭৭.৮৭	৫৯.৭০	৫৯.৮৯	৮.৯৭
১১	হরিয়ানা	৬৮.৫৯	৭৯.২৫	৫৬.৩১	৫৫.৮৫	১২.৭৪
১২	নাগাল্যান্ড	৬৭.১১	৭১.৭৭	৬১.৯২	৬১.৬৫	৫.৪৫
১৩	কর্ণাটক	৬৭.০৪	৭৬.২৯	৫৭.৪৫	৫৬.০৪	১১.০০
সাক্ষরতার হার জাতীয় গাড়ের (৬৫.৩৮%) নিচে						
০১	ছত্তিশগড়	৬৫.১৮	৭৭.৮৬	৫২.৪০	৪২.৯১	২২.২৭
০২	আসাম	৬৪.২৮	৭১.৯৩	৫৬.০৩	৫২.৮৯	১১.৫২
০৩	মধ্যপ্রদেশ	৬৪.১১	৬৭.৮০	৫০.২৮	৪৪.৬৭	১৯.৪১
০৪	ওড়িশা	৬৩.৬১	৭৫.৯৫	৫০.৯৭	৪৯.০৯	১৪.৫২
০৫	মেঘালয়	৬৩.৩১	৬৬.১৪	৬০.৪১	৪৯.১০	১৪.২১
০৬	অন্ধ্রপ্রদেশ	৬১.১১	৭০.৮৫	৫১.১৭	৪৪.০৯	১৭.০২
০৭	রাজস্থান	৬১.০৩	৭৬.৪৬	৪৪.৩৪	৩৮.৫৫	২২.৪৮
০৮	দাদরা ও নগর হাভেলি*	৬০.০৩	৭৩.৩২	৪২.৯৯	৪০.৭১	১৯.৩৩
০৯	উত্তরপ্রদেশ	৫৭.৩৬	৭০.২৩	৪২.৯৮	৪০.৭১	১৬.৬৫
১০	অরুণাচন প্রদেশ	৫৪.৭৪	৬৪.০৭	৪৪.২৪	৪১.৫৯	১৩.১৫
১১	জম্মু ও কাশ্মীর	৫৪.৪৬	৬৫.৭৫	৪১.৮২	NA	NA
১২	ঝাড়খণ্ড	৫৪.১৩	৬৭.৯৪	৩৯.৩৮	৪১.৩৯	১২.৭৪
১৩	বিহার	৪৭.৫৩	৬০.৩২	৩৩.৫৭	৩৭.৪৯	১০.০৪

* এই চিহ্নগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

★ ২০০১ সালের সর্বশেষ জনগণনা অনুসারে, মহিলাদের সাক্ষরতার সর্বভারতীয় হার ৫৪.১৬
★ সাক্ষরতার সর্বভারতীয় হার ১৯৫১ সালের ১৮.৩৩% থেকে বেড়ে ২০০১ সালে হয়েছে ৬৫.৩৮%
★ মহিলাদের সাক্ষরতার সর্বভারতীয় হারও ১৯৫১ (৮.৮৬%) সালের তুলনায় ২০০১ (৫৪.১৬) সালে বেড়েছে
★ লক্ষণীয়, মহিলাদের সাক্ষরতার হার ১৯৯১-২০০১ সালের মধ্যে বেড়েছে ১৪.৮৭%, এই সময়কালে পুরুষদের বেড়েছে তুলনায়, ১১.৭২%। অর্থাৎ পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বৃদ্ধির হার ৩.১৫% বেশি
★ ২০০১-এর জনগণনায় তফশিলী জাতি (SC) ও তফশিলী উপজাতি (ST) সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৫৪.৬৯% ও ৪৭.১০%
★ কয়েকটি রাজ্যে তফশিলী জাতির মহিলাদের সাক্ষরতার হার জেনারেল কাস্টের মহিলাদের তুলনায় বেশ কম। রাজ্যগুলি হল বিহার (১৫.৫৮%), ঝাড়খন্ড (২২.৫৫%), উত্তরপ্রদেশ (৩০.৫০%) ও রাজস্থান (৩৩.৮৭%)
★ বিহারে (১৫.৫৪%) তফশিলী উপজাতির মহিলাদের সাক্ষরতার হার খুবই কম
★ ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে সাক্ষরতার হার তফশিলী জাতির ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা গেছে, বিহারে (২৮.৪৭%) সবথেকে কম এবং মিজোরামে (৮৯.২০%) সবথেকে বেশি। তপশিলী উপজাতির ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা গেছে, বিহারে (২৮.১৭%) সবথেকে কম এবং মিজোরামে (৮৯.৩৪%) সবথেকে বেশি
★ ভারতের ৪টি রাজ্য (ঝাড়খন্ড, মেঘালয়, মিজোরাম ও সিকিম) ছাড়া অন্য রাজ্যগুলিতে সাধারণভাবে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে তফশিলী উপজাতির তুলনায় তফশিলী জাতি এগিয়ে রয়েছে

সাক্ষরতার তথ্যের ক্ষেত্রে জনগণনার রিপোর্ট-ই সবথেকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়। সাক্ষরতা বলতে জনগণনায় যা বলা হয়েছে তা হল কোন ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারার যোগ্যতা অর্জন। যিনি পড়তে পারেন কিন্তু লিখতে পারেন না, জনগণনা অনুসারে তিনি সাক্ষর নন। এই সজ্ঞানুসারে সর্বশেষ জনগণনার রিপোর্টে (২০০১) দেখা যাচ্ছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার ৬৫.৩৮ শতাংশ। সাক্ষরতার হারে পুরুষদের (৭৫.৮৫%) তুলনায় নারীরা (৫৪.১৬) পিছিয়ে আছে। ১৯৯১-এর তুলনায় সব রাজ্যেই সাক্ষরতার হার বেড়েছে, কিন্তু একশ শতাংশ থেকে পশ্চিমঙ্গসহ বেশিরভাগ রাজ্যই অনেক দূরে। আবার মহিলারা সব রাজ্যেই পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে, এমনকী কেরলেও, যেখানে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক। ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয়েছে। ২০১১-তে হবে নতুন জনগণনা। শিক্ষার অধিকার আইন দেশের সব নারী-পুরুষকে অন্তত সাক্ষর করে তুলতে পারল কিনা তা বুঝতে অবশ্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও এক দশক।

সংকলন : রবি রায়

ইংরাজী বর্ষপঞ্জি ২০১০

জানুয়ারি

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
৩১	শিশু নির্যাচন বন্ধ হোক				১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

ফেব্রুয়ারি

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
২৮	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

সব শিশুকে খাদ্যের অধিকার দিতে হবে

মার্চ

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১	লিঙ্গভেদ দূর হোক		

এপ্রিল

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
স্কুলছুট বন্ধ হোক				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

মে

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
৩০	৩১					১
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯

জুন

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	শিশু-অপুষ্টি রোধ কর		

জুলাই

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
শিশুশ্রম আর নয়				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১

আগস্ট

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

সেপ্টেম্বর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

অক্টোবর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
৩১	শিশুপাচার বন্ধ হোক				১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

নভেম্বর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০				

ডিসেম্বর

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	

শ্রীপঞ্চমী	২০ জানুয়ারী
নেতাজী জন্মজয়ন্তী	২৩ জানুয়ারী
প্রজাতন্ত্র দিবস	২৬ জানুয়ারী
দোলযাত্রা	২৮ ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক নারী দিবস	৮ মার্চ
বিশ্ব বনসৃজন দিবস	২১ মার্চ
বিশ্ব জল দিবস	২২ মার্চ
গুডফ্রাইডে	২ এপ্রিল
বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	৭ এপ্রিল
বাংলা নববর্ষ	১৫ এপ্রিল
মে দিবস	১ মে
বিশ্ব পরিবেশ দিবস	৫ জুন
হুল দিবস	৩০ জুন
হিরোসিমা দিবস	৬ আগস্ট
নাগাসাকি দিবস	৯ আগস্ট
ভারত ছাড়ো দিবস	৯ আগস্ট
আত্মবলিদান দিবস	১১ আগস্ট
স্বাধীনতা দিবস	১৫ আগস্ট

নতুন বছরে এরা সবাই শিক্ষার অধিকার ভোগ করুক

সেপ্টেম্বর ৫	শিক্ষক দিবস
সেপ্টেম্বর ১১	ইদ-উল-ফিতর
অক্টোবর ১	বিশ্ব বাসস্থান দিবস
অক্টোবর ২	গান্ধী জন্মজয়ন্তী
অক্টোবর ৭	মহালয়া
অক্টোবর ১৪-১৭	দুর্গাপূজা
অক্টোবর ১৬	বিশ্ব খাদ্য দিবস
অক্টোবর ২২	লক্ষ্মীপূজা
নভেম্বর ২	গুরুনানক জন্মজয়ন্তী
নভেম্বর ৫	কালীপূজা
নভেম্বর ১৭	ইদ-উজ-জোহা
নভেম্বর ২৮	শিক্ষার অধিকার দিবস
ডিসেম্বর ১	বিশ্ব এডস দিবস
ডিসেম্বর ২	জাতীয় দূষণবিরোধী দিবস
ডিসেম্বর ৩	বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস
ডিসেম্বর ১০	মানবাধিকার দিবস
ডিসেম্বর ১৭	মুহরম
ডিসেম্বর ২৫	ক্রিশমাস দিবস

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wben@vsnl.net, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ অনুদান : ২ টাকা
কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য